'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নাগরিক লোকসংস্কৃতির স্বরূপ

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ: কবি ও গীতিকার হিসেবে অতুলনীয় খ্যাতি ও মনস্বিতার অধিকারী বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সৃষ্টিশীলতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনস্বরূপ বাংলার বহুবর্ণিল লোকসংস্কৃতিসমৃদ্ধ *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসটি প্রতিনিধিস্থানীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এ উপন্যাসটি শুধু তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বরং বাংলা উপন্যাসের ধারাতেও অনন্যসাধারণ সৃষ্টিকর্মের স্মারক। নজরুল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের নাগরিক লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চালচিত্রকে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও সতর্ক পর্যবেক্ষণসহ এতে রূপায়িত করেছেন। গত কয়েক দশকজুড়ে পাশ্চাত্যে ও সম্প্রতি বাংলাভাষী অঞ্চলে নাগরিক লোকসংস্কৃতি[১] সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব ও ভাবনার প্রবর্তন ঘটেছে। এ উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক ও ভদ্র-শিক্ষিত সমাজের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক দিনযাপন, জীবিকানির্ভরতা ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কথামালায় বাঙ্ময় হয়েছে নাগরিক লোকসংস্কৃতি-সন্নিহিত বিবিধ প্রসঙ্গ। নজরুলের সমকালে তাঁর সহযাত্রী কথাশিল্পীরা, বিশেষত 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকেরা কলকাতা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী শহর-শহরতলি-মফস্বলের পটভূমিতে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু বাংলার নাগরিক লোকসংস্কৃতির রূপায়ণে তাঁরা বিশ্বস্ত শিল্পসামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। মাটিঘেঁষা, কায়িক শ্রমক্লিষ্ট বাংলার মেহনতি জনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য আন্তরিকতাঘনিষ্ঠ সাহচর্য ছিল তাঁর সাহিত্যচর্চার অন্যতম অবলম্বন। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়ক এলাকার প্রান্তিক বাঙালি মুসলমান ও ধর্মান্তরিত রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের জীবনপ্রবাহের বৃত্তান্ত রূপায়ণসূত্রে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও সচেতন সমাজভাবনার সমবায়ে লেখক এখানকার নাগরিক লোকসংস্কৃতির পরিসর ও বাসিন্দাদের যূথচারিতার আখ্যানকে নবভাষ্যে উন্নীত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এ উপন্যাসে বিধৃত কৃষ্ণনগরের নাগরিক লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করেছি।

গত শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে আমেরিকা ও ইয়োরোপে লোকসংস্কৃতি চর্চায় গ্রামীণ সমাজের বাসিন্দা হিসেবে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহ ও ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গসমূহকেই 'লোকসংস্কৃতি' বা 'ফোকলোর' হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[২] তবে ষাটের দশক থেকে ধীরে ধীরে এ ভাবনায় পরিবর্তন আসে এবং লোকসংস্কৃতিতাত্ত্বিক/লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের মধ্যেও নতুন ধারণার পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ ঘটে।[৩] কারণ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতি,

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.3

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও নিত্যনতুন তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, দৈশিক ও বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, আধুনিক জীবনবোধ প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি তাদের চেতনালোকে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে। কাজেই কালের বিবর্তনে ঐতিহ্যগত পেশা ও প্রাচীন ধরনের জীবনপ্রণালি ছেড়ে পরিবারের ভরণপোষণের টানে গ্রামের মানুষকে কর্মানুসন্ধানে শহরে আসতে হয়। পাশাপাশি শহরের ছিন্নমূল, ভবঘুরে, উদ্বাস্তু, শ্রমজীবী মানুষেরাও বিশেষ কোনো দল বা সমষ্টির অংশ হিসেবে 'লোক'[৪] পরিচয়ে স্বতন্ত্রভাবে দিনযাপন করে, যেখানে প্রকাশিত হয় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিবোধ ও সৃষ্টিশীলতা — কখনো মৌখিক মাধ্যমে, কখনো বিভিন্ন কাজে। নগরের বাসিন্দা হিসেবে প্রান্তিক শ্রেণির প্রতিনিধিদের অনুসৃত সংস্কৃতির প্রভাব শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভাবনা, আচরণ, সংলাপ এবং মনস্তত্ত্বেও ছাপ ফেলে। অর্থাৎ, লোকসংস্কৃতি নিজস্ব নিয়মেই গ্রাম-নগর-শহর-মফস্বল-বন্দর নির্বিশেষে সমষ্টিচেতনায় বিভিন্ন মাধ্যম ও অনুষঙ্গে বাহিত হয় ও পরিবর্তিতরূপে সক্রিয় থাকে। পরস্পরসাপেক্ষ জীবনযাপনের সূত্রে নিত্যদিনের ওঠাবসা, যোগাযোগ, জীবিকাধারণ, সামাজিকতা-সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বৈষয়িক-সাংস্কৃতিক-শৈল্পিক সংযোগসূত্রে সম্প্রসারণশীল বিধায় এই মিথস্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যাদি কখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কখনো বা অস্পষ্টভাবে আভাসিত হয়।

১.

ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, নরওয়েজীয় ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের প্রভাবে নজরুলের সমকালে *কল্লোল*, *কালি-কলম*, *প্রগতি*, *উত্তরা* প্রভৃতি পত্রিকাসমূহে সাহিত্যচর্চারত লেখকদের লেখায় সমাজের শিক্ষিত, অভিজাত, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষদের এড়িয়ে সমাজের নিচুতলার অবহেলিত ব্রাত্য জনজীবনকে বাস্তবানুগভাবে উপস্থাপনের যে প্রচেষ্টা তা অবশ্যই তাৎপর্যবহ।[৫] নজরুলও নিঃসন্দেহে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৬] কিন্তু এঁদের সঙ্গে নজরুলের কথাশিল্পীসুলভ স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব অনুধাবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, তাঁর সামাজিক অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা।[৭] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, গোকুল নাগ, মণীশ ঘটক প্রমুখ নজরুলের মতো নিবিড়ভাবে লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অনুভবকে নিত্যদিনের যাপনরীতিতে, পারিবারিক সংকটে, ব্যক্তিগত জীবনের উঠতি পর্যায়গুলোতে ধারণ করেননি।[৮] পারিবারিক আবহ, দিনযাপনের ভিন্নতা, শ্রেণি-অবস্থান ও সামাজিক পরিচিতি, শিক্ষা-রুচি-অভ্যাস, কর্মব্যস্ত জীবনপ্রবাহের ভিন্ন অভিমুখ প্রভৃতি কারণে নজরুলের সঙ্গে তাঁদের ভাবনা-মানসিকতা-শিল্পীসুলভ মেজাজ ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের গড়নে যোজনদূর ব্যবধান স্পষ্টই অনুধাবনযোগ্য।[৯] এদিক থেকে নজরুলের জীবনপথের অভিজ্ঞতা, সৃষ্টিশীলতা এবং শিল্পবোধ বহুলাংশেই

লোকমানুষের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভিক্ষুক, চোর, ডাকাত, পতিতা, বেদে, ভবঘুরে, উন্মূলিত মানুষদের নিয়ে লিখিত 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকদের লেখায় প্রতিফলিত প্রান্তিক জীবনধারাকে নজরুল অবলীলায় অতিক্রম করেছেন *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে বিধৃত নাগরিক লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহে পরিবেষ্টিত লোকপরিমণ্ডলের অনায়াস গ্রন্থনায়। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ইংরেজ শাসনামলের কৃষ্ণনগরের 'টাউন' এবং চাঁদ-সড়ক[১০] এলাকার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা-রাস্তা, পুকুর-ঘাট, দোকানপাট, হাট-বাজার, লোকালয়, মসজিদ-গির্জা প্রাঙ্গণ, এমনকি এতদঞ্চল ছাড়িয়ে রানাঘাট, কলকাতা, পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ ও বরিশাল, সুদূর রেঙ্গুন ও ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত বিন্যস্ত সুবিশাল ভৌগোলিক পরিসরযুক্ত কুশীলবদের জীবনপ্রবাহ অঙ্কনে লেখকের কুশলী শিল্পভাবনার রূপায়ণ লক্ষণীয়। তিনি আটাশ পরিচ্ছেদে বিবৃত উপন্যাসটির সর্বজ্ঞদর্শী বিবরণে 'লোক' হিসেবে বিবেচিত কায়িক শ্রমনির্ভর বিভিন্ন পেশাজীবী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনাখ্যান উপস্থাপন করেছেন। এরা চাঁদ-সড়ক এলাকার প্রান্তিক মুসলমান ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। স্মর্তব্য, স্বল্পসংখ্যক হিন্দুও তাদের প্রতিবেশী। এরা জাতি-পেশাগত পরিচয়ে রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চি, গাড়োয়ান, কোচোয়ান, চাষি, কুলি-মজুর, মেথর, গয়লা, মুর্দাফরাশ, ধাত্রী বা দাই, কামার, ঘরামি, ক্যাওরা প্রভৃতি পরিচয়ে সামাজিকভাবে চিহ্নিত। এ উপন্যাসে আমরা কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক ও নাগরিক বাসিন্দাদের দিনযাপন, অভ্যাস, আচরণ, পারস্পরিক আলাপচারিতা, ওঠাবসা, লেনদেন, এমনকি মনোজাগতিক ভাবপরিমণ্ডলের রূপরেখা অনুধাবনসূত্রে নাগরিক লোকসংস্কৃতি-সংলগ্ন বিভিন্ন উপাদানকে চিহ্নিত করতে পারি। এগুলো হলো, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকসাহিত্য, লোকপ্রথা, লোকক্রীড়া, লোকখাদ্য, লোকপরিচ্ছদ ও প্রসাধন, লোকপ্রযুক্তি, লোকভাষা প্রভৃতি।

১.১ লোকবিশ্বাস

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন উপাদান লোকবিশ্বাস, যার সঙ্গে আদিম কৌমজীবী মানুষের সম্পৃক্ততার সূত্রপাত ঘটেছে সভ্যতার উন্মেষলগ্নে। সময় যতই অতিক্রান্ত হয়েছে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ, সামাজিক বাস্তবতা, ভৌগোলিক পরিসর ও লোকসমাজের গড়ন, এর অন্তর্গত বাসিন্দাদের ভাবনা-মানসিকতা অনুযায়ী বিশ্বাসের ধারায় রূপান্তর ঘটেছে। *মৃত্যুক্ষুধায়* বাঙালি সমাজে প্রচলিত এমন কিছু লোকবিশ্বাসের রূপায়ণ লক্ষণীয়, যা কুশীলবদের ভাবনা ও মনোলোকে প্রতিফলিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বামী, শ্বশুর, ছেলে বা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ওপর নির্ভরতার কারণে স্ত্রী, গৃহবধূ, মেয়েদের সাধারণত গৃহকর্ম সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা থাকে। ফলে শিক্ষাগ্রহণ ও আর্থিক স্বাবলম্বিতাহীন নারীদের প্রায়শ অবরুদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। সেকারণে সংসারের দায়িত্ব পালন করেও তারা

প্রাপ্য অধিকার-সুবিধা থেকেই শুধু বঞ্চিত হয় না, বরং পুরুষ অভিভাবকদের অযৌক্তিক, স্বেচ্ছাচারী, হঠকারী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। পেশায় রাজমিস্ত্রি প্যাঁকালের ছোট বোন পাঁচি স্বামীর বাড়ি ছেড়ে মা-ভাইয়ের আশ্রয়ে চলে আসে সন্তানসম্ভবা অবস্থায়। কারণ তার স্বামী কোনো এক ক্যাওরার মেয়েকে মুসলমান করে নিকা করেছে। সতিনকে নিয়ে পাঁচি সেই সংসার করতে রাজি নয়। বিধবা প্যাঁকালের মায়ের একান্নবর্তী বড় পরিবারে উপার্জনক্ষম হিসেবে শুধু প্যাঁকালেই রয়েছে। তার স্বামী ও বিবাহিত তিন ছেলে মৃত্যুবরণ করেছে। তিন ছেলের বৌ ও বারোজন নাতি-নাতনিকে নিয়ে সংসারের নিত্যদিনের ভরণপোষণ জোগানো তার পক্ষে দুঃসাধ্যপ্রায়। দারিদ্র্য ও আর্থিক টানাপড়েনের কশাঘাতে পরিবারটি পর্যুদস্ত। এমতাবস্থায় সন্তানসম্ভবা বৃদ্ধার মেয়ে পাঁচির স্বামীর বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে আসার ঘটনাটিকে সাংসারিক বোঝা হিসেবেই সে ভেবে নেয়। তাদের মনোবৃত্তিতে নিয়তিবাদী ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। পাঁচির দুরবস্থাকে কপালের লিখন বা বিধির বিধান হিসেবে মেনে নিতে এ পরিবারটি বাধ্য হয়েছে। স্বামীর হঠকারিতা, স্ত্রীকে অবহেলাপূর্বক সেই পুরুষের অন্য নারীর প্রতি আগ্রহ ও পরিণতিতে তাকে বিয়ে করা প্রভৃতি ঘটনার পরিণতিতে পাঁচির সংসার পরিত্যাগকে প্রান্তিক মানুষ নিছক কপালের লিখন হিসেবে মেনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এর প্রতিকারের উপায় ও সঙ্গতি না থাকায়। তাদের বিশ্বাস, 'কপালে সুখ লেখা না থাকলে পাথরে ঠুকেও লাভ নেই। ওতে কপাল যথেষ্টই ফোলে, কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না' (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৮)। স্বামী-সন্তানের ভালো-মন্দ বিবেচনার দায় যেমন বাঙালি সংসারে নারীর ওপর আরোপিত, তেমনিভাবে তাদের কোনো বিপদ ঘটলে সেটিকেও পরিবারের নারী অভিভাবক মন্দ ভাগ্য বা পোড়া কপাল হিসেবে বিবেচনা করে। এ উপন্যাসে প্যাঁকালের বাবা ও তার ভাইদের মৃত্যুর বিবরণ বা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অনুল্লেখিত। একান্নবর্তী বড় পরিবারের নানা কাজের বোঝা সামলাতে গিয়ে প্যাঁকালের মাকে হিমশিম খেতে হয়। ফলে যুবক ছেলে সোভানের মৃত্যুর পরিণতিতে তার অপরূপা, বুদ্ধিমতী ও বিবেচনাসম্পন্ন স্ত্রী বা 'মেজো-বৌ'কে তার দুলাভাই 'নিকা' করবে, এমন আশঙ্কায় প্যাঁকালের মা তাকে পরামর্শ দেয় 'ভাবী'কে বিয়ে করতে। প্যাঁকালেকে সে জানায় — 'অমন বউ আমার পর হয়ে যাবে! আমার কপালই যদি না পুড়বে তাহলে সোভানই বা মরবে কেন... কপাল মা, কপাল!... ঐ বুড়ো মিনসেই ছিল ছুঁড়ির কপালে!' (রফিকুল, ২০০৭: ৩২৮-৩২৯) ছেলে সোভানের মৃত্যুর ঘটনাকে সেই অসহায় জননী মেনে নিতে বাধ্য হয় কপালের লিখন হিসেবে। মানবজীবনের পরিণতি হিসেবে মৃত্যুবরণের ব্যাপারটি লোকসমাজে নিয়তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এভাবেই বিবেচিত হয়। প্যাঁকালের মায়ের অসহায়ত্ব প্রলম্বিত হয় একারণে, সোভানের বউকে নাকি কলকাতার চামড়ার ব্যবসায়ী পয়সাওয়ালা দুলাভাই বিয়ে করবে! এ বিষয়টি মানতে না পেরেই মূলত প্যাঁকালের মায়ের আক্ষেপ ও হাহাকার তীব্র হয়।

পুনর্জন্মবাদের ধারণা সনাতন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক বিধির সঙ্গে যুক্ত হলেও লোকসমাজে তা বহুকালের পরিবর্তনের ধারায় ভিন্ন দ্যোতনায় উপস্থিত থেকেছে। বিশেষত প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়ে পুনর্জন্মের প্রসঙ্গটি স্বকীয় লোকবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে, যেখানে সনাতন কর্মবাদের প্রভাব অনুপস্থিত।[১১] এ উপন্যাসে নজরুল মুসলমান সমাজে পুনর্জন্মের প্রসঙ্গটিকে এনেছেন প্রিয়জনহারা মানুষের স্মৃতিচারণ ও তাকে কাছে পাবার আকুলতাজাত অনুষঙ্গে। মৃত ব্যক্তির প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় জেনেও তার স্বজন যে কাতর হয়, সান্নিধ্য প্রত্যাশা করে — এ মানবিক সংবেদনার রূপায়ণ ঘটেছে 'চতুর্থ' পরিচ্ছেদে বিধৃত ঘটনায়। মেজো ছেলে সোভানের মৃত্যুতে ব্যথিত তার মায়ের শোক সাংসারিক বিপন্নতার আঘাতে আরও তীব্র হয়ে উঠলে নাতি হানপেকে কাছে টেনে নিয়ে সেই অসহায় বৃদ্ধা নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। সে খেয়াল করে, ছোটবেলায় সোভান যেভাবে তার মায়ের কান্না থামাতে চেষ্টা করত, তার ছেলে হানপেও ঠিক তেমনি করেই দাদীর কান্না থামাতে চায়। নাতির সঙ্গে মৃত ছেলের চেহারার সাদৃশ্য, আচরণে মিল খুঁজে পেয়ে বৃদ্ধা অবশেষে নিজেকে সামলে ওঠে — 'কে বলে সোভান মরেছে? এই তো সে-ই তো এসেছে আবার তেমনি খোকাটি হয়ে। এই তো রয়েছে তার গলা জড়িয়ে।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩১৫) স্বামীকে হারানোর বেদনায় আপ্লুত মেজো-বৌ তার ছেলেকে সান্ত্বনা জানিয়েছিল এই বলে যে তার বাবা ক্ষীর-পরবের দিন (ঈদ) আসবে। সেকারণেই তার মা যেহেতু সেদিন ক্ষীর রাঁধছিল, হানপের চিত্তলোকে বাবাকে কাছে পাবার আকুলতা আরো বাড়ে। প্রিয়জনহারা মানুষের শূন্যতার হাহাকার ও তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরার অনুষঙ্গে পুনর্জন্মের ভাবনা মুসলমান সমাজে পরিবর্তিতরূপে এভাবে গৃহীত হয়েছে। সোভানকে হারানোর বেদনায় কাতর তার মা বারবার সোভানকে কাছে টেনে নেয়, মায়ের কঠোর শাসনের কবল থেকে রেহাই দিতে। নাতিকে কাছে টেনেই সে মৃত ছেলেকে বারবার ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে, কল্পনাবশত নাতি ও ছেলের মিল খোঁজে। অথচ বড়-বৌকে উদ্দেশ্য করে বৃদ্ধার বলা কথার ভিন্ন তাৎপর্য দাঁড়ায়। কারণ বড়-বৌ তার মৃত স্বামীর সঙ্গে সোভানের (চাচা-ভাতিজা সম্পর্কসূত্রে) চেহারার, বিশেষত কপালের মিল খুঁজে পায়। লোকসমাজে মৃত প্রিয়জনের প্রতি আকুতি, তাকে কাছে পাবার প্রত্যাশাগত অভিলাষ পুনর্জন্মের ভাবনাকে বদলে দিয়েছে স্বীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই। ইসলাম ধর্মে পরকালের (আখেরাত) ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে ইহজাগতিকতার অবসান ঘটলেও কেয়ামতের পর মৃতের পুনরুত্থানের বৃত্তান্ত মিলেমিশে লোকসমাজে পুনর্জন্মের ধারণা এভাবে গৃহীত হয়েছে।

স্বপ্নদর্শনের অভিজ্ঞতা আধুনিককালের শিক্ষিত সমাজে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবিধ ব্যাখ্যাযোগে গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, অ্যাডলার, কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ, সাম্প্রতিককালের জাক লাঁকা ও অন্য মনোবিজ্ঞানীদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ

গবেষণার ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু প্রায় নিরক্ষর, পশ্চাৎপদ ও বিজ্ঞানচেতনাহীন নিয়তিবাদী লোকসমাজে স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন বিচিত্র লোকবিশ্বাসের বাহন হয়ে ওঠে। প্রাত্যহিক দিনযাপনের অজস্র কর্মব্যস্ততা-কোলাহলের পরিণতিতে এর সমান্তরালে অবচেতন ও অচেতন মনের দুর্ভেদ্য-রহস্যময় ভূমিকা সম্পর্কে লোকসমাজ অবহিত নয়। ফলে বহুকাল থেকেই স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা তাদের সমষ্টিচেতনায় বিশেষ ধরনের লোকবিশ্বাসের উদ্ভব ঘটায়, যা সমষ্টিচেতনায় লোকসংস্কার হিসেবে গৃহীত হয়। স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা হিসেবে লোকসমাজে ফালনামা, খোয়াবনামা প্রভৃতি বইয়ের প্রতি নির্ভরতার পাশাপাশি পীর-ফকির-জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হওয়ার রেওয়াজ বহুকালের। স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়ে এর গূঢ়ার্থ জানার ইচ্ছাও তাদের মানসলোকের বিভিন্ন দিক উন্মোচনের সহায়ক সূত্র হয়ে ওঠে। এমনকি শিক্ষিত সমাজেও স্বপ্ন দেখা ও এর ব্যাখ্যা ভিন্ন তাৎপর্যে গৃহীত হয়। স্বপ্নের দৃশ্যাবলি কখনো প্রশান্তিদায়ক, কল্যাণকর ও আনন্দময়, কখনো দুঃস্বপ্ন বা বিপদের আলামত হিসেবে সমষ্টিমানসে চিহ্নিত হয়। রূপক-প্রতীক ও সংকেতের প্রয়োগ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যুক্ত হয়ে স্বপ্নদর্শনকারীর মনোভাবনাকে স্পষ্ট করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। *মৃত্যুক্ষুধায়* স্বপ্নদর্শনকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। মৃত ব্যক্তি যখন তার প্রিয়জনের স্বপ্নে হাজির হয়, তখন সেও কোনো বিপদের বা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় বা মৃত্যুবরণ করে। কোনো অসুখে আক্রান্ত হওয়া, পারিবারিক দুর্যোগ বা বিপত্তি, অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রভৃতি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সেই ব্যক্তির ভবিষ্যতের ইশারাও এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে স্বপ্নদর্শনের অন্তরালবর্তী বৃত্তান্ত হিসেবে। অসুস্থ সেজো-বৌ তার ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে অনাহারে ভুগতে ভুগতে বিপন্নপ্রায়। স্বামীহীন বিধায় শ্বশুরবাড়িতে বৃদ্ধা শাশুড়ি, দেবর ও দুই জায়ের আশ্রয়ে সে প্রতিপালিত। চিকিৎসাগ্রহণে সঙ্গতিহীন, দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত না থাকায় মৃত্যুবরণই যেন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় সে তার মৃত স্বামীকে স্বপ্ন দেখে এবং ভাবতে থাকে যে, এবার সেও দুনিয়ার মায়া কাটাবে। সেজো-বৌয়ের ধারণা, তার স্বামী যেন তাকে নিতেই এসেছে। কিন্তু সেই ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে মৃত বারিক তার ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার কথা স্বপ্নে সেজো-বৌকে জানায়। মেজো-বৌয়ের কাছে সেজো-বৌয়ের বিলাপে বিবৃত হয়েছে স্বপ্নকেন্দ্রিক বৃত্তান্ত, যেখানে ছেলের নিরাপত্তাজনিত শঙ্কা ও তাকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে না পারার অসহায়ত্ব প্রকট। শুধু তা-ই নয়, সে নিজেও যে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকে চলে যাবে, সেই ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে স্বপ্নদর্শনকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বামীকে হারানোর বেদনাময় স্মৃতি, যেখানে প্রিয়জনের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মর্মন্তুদ শোক ঘনীভূত হয়ে সেজো-বৌয়ের অবচেতনলোকে মৃত্যুজনিত বিভীষিকাকেই জাগিয়ে তোলে। মেজো-বৌয়ের মনে আশঙ্কা জেগেছিল, সেজো-বৌ হয়ত আর বাঁচবে না। তার

স্বপ্ন দেখার বৃত্তান্তকে মেজো-বৌ বিশ্বাস করেছিল বলেই ছোট জায়ের শেষ সাধ কী সেটি জেনে তা মেটাতে চেয়েছিল। সেই রাত পার হবার পূর্বেই অসুস্থ সেজো-বৌ মৃত্যুবরণ করলে মেজো-বৌয়ের করুণ বিলাপে এ শোকময় ঘটনা পরিবারের লোকজন জানতে পারে। সেজো-বৌয়ের মৃত্যুর পরই তার অসুস্থ ছেলেও মারা যায়। ফলে অসুস্থ সেজো-বৌ ও তার ছেলের অসুস্থতাজনিত মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে উক্ত স্বপ্নদর্শনের যুক্তিগ্রাহ্য সংযোগ না থাকলেও তার পরিবারের স্বজনদের কাছে, অন্তত মেজো-বৌয়ের কাছে ব্যাপারটি অবশ্যই বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত। কারণ সেজো-বৌয়ের স্বপ্নদর্শন তার কাছে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা হিসেবেই গৃহীত, লোকমানসের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বহুকাল ধরেই স্বীকৃত, এ বিবেচনায়। স্মর্তব্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন ও *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩) উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শনের ঘটনা তাদের পরিণাম বা মৃত্যুর ইঙ্গিতবহ ব্যঞ্জনায় উন্নীত হয়েছিল।

মৃত ব্যক্তির নাম নেয়া বা তাকে স্মরণ করা ক্ষেত্রবিশেষে অশুভ ও বিপদের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সেকারণে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই লোকসমাজে মান্য রীতি। মেজো-বৌকে বিয়ে করবে না বিধায় প্যাঁকালে মা-বোনের সঙ্গে কলহের জের ধরে বাড়ি ছেড়ে রানাঘাটে চলে যায় দিনমজুরি করতে। তার ভাতিজা হানপে এ ব্যাপারটি না জানায় মায়ের কাছে যখন সে বলে যে তার ছোট-চাচা বুঝি বাবার মতোই মারা গেছে, তখন মেজো-বৌ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

ভূত-প্রেত-পেতনি প্রভৃতি অশরীরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস লোকসমাজে প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। সনাতন ধর্মের বিধান অনুযায়ী মৃতের আত্মার সদগতির বন্দোবস্ত ও পিণ্ডদান করা না হলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে চেনা কারো রূপ ধারণপূর্বক স্বজনদের ক্ষতি করতে পারে, এমন বিশ্বাস প্রবল। মুসলমান সমাজে জ্বিন-শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকৃত। ফলে অশরীরী প্রাণী বা সত্তার অস্তিত্ব লোকসমাজে আতঙ্ক, বিপদ, অশুভের বার্তাবহ। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদিত না হলে সে ভিন্ন রূপ বা বেশ ধারণ করে, এমন ভাবনা স্পষ্টতই সনাতনধর্মের জন্মান্তরবাদের প্রভাবগত। কারণ এ শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী, কর্মের ফল সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি জন্মে ব্যক্তিকে নতুন রূপে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এসব ধারণা লোকসমাজে অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য ও শক্তিসম্পন্ন অশরীরী সত্তার উদ্ভব ঘটিয়েছে।[১২]

সনাতন ধর্মের প্রভাবজাত এসব লোকবিশ্বাস মুসলমান সমাজেও বাহিত হয়েছে, এ উপন্যাসে যার রূপায়ণ প্রান্তিক লোকগোষ্ঠীর পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিদের কথোপকথনে লক্ষণীয়। মেজ-বৌয়ের সঙ্গে আলাপের একপর্যায়ে মরণাপন্ন সেজো-বৌ বলেছিল, "এমন ঘুমুব যে, হু-ই 'গোদা ডাঙায়' গিয়ে রেকে আসবে তিনগাড়ি মাটি চাপা দিয়ে। যেন ভূত হয়েও আর ফিরে

আসতে না পারি!" (রফিকুল, ২০০৭: ৩৪০-৩৪১) অপমৃত্যুর শিকার হওয়া বা শেষকৃত্য যথাযথভাবে সম্পাদিত না হওয়ার পরিণতিতে 'ভূত' হওয়ার পরিবর্তে প্রিয়জনের কাছ থেকে চলে যাবার আক্ষেপই এ সংলাপে প্রকাশিত। আনসারের সম্পর্কের বোন লতিফা তার স্বামী নাজির হোসেনের সঙ্গে পরিহাসছলে বলেছিল, 'শ্যাওড়া গাছে বেশ, আমি পেত্নীই হলাম। এখন গোলমাল যদি কর, সত্যিই ভেঙে দেব।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৫৭) শ্যাওড়া গাছ, তাল গাছ, বেল গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশতলায় অশরীরীরা ঘোরাফেরা করে, এমনকি এসব গাছই তাদের বিচরণস্থল, তারা সুযোগ পেলে নির্জনে নিভৃতে নিয়ে অমনোযোগী একলা পথিকের ঘাড় মটকে দেয়; এরূপ লোকবিশ্বাসের প্রতিধ্বনি লতিফার সংলাপে ঘটেছে। এ আলাপের ধারাবাহিকতায় লতিফাকে নাজির জানিয়েছিল, 'পেত্নীকে পেলে আর কেউ ছুঁতে সাহস করে!' ইংরেজ নার্স মিস জোন্সের সঙ্গে নাজিরের আলাপের সূত্র ধরে তাকে 'পেত্নী' হিসেবে সম্বোধন লোকবিশ্বাসের খল নারীর অশুভ ভাবমূর্তিকেই স্মরণ করায়। (রফিকুল, ২০০৭: ৩৬২) বাংলা বাগধারা 'ভূতে পাওয়া'র অর্থ হলো ঘোরে আচ্ছন্ন হওয়া, যুক্তি-বুদ্ধি বিবেচনা না করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের পর মেজো-বৌ মিশনারির নির্দেশে কৃষ্ণনগর ছেড়ে বরিশাল যেতে বাধ্য হওয়ায় ছেলে-মেয়ের পিছুটান ভুলতে চেয়েছিল। লেখক জানিয়েছেন, (মেজো-বৌ) 'ইচ্ছা করেই ছেলেমেয়েদের ফেলে এসেছিল। চলে আসার দিন তাকে যেন ভূতে পেয়েছিল।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৮৬) মা হিসেবে সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও বাৎসল্যকে সে সেদিন কঠোরভাবে সামলেছিল বিদায়কালে পিছুটান ভুলতে।

অশুভ ও অমঙ্গলসূচক কিছু লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। যেমন — রাতের অন্ধকারে যে ঘরে খুকি একাকী শায়িত, সে ঘরের মাথার ওপর দিয়ে বাদুড়ের উড়ে যাওয়া মৃত্যুর বার্তাকেই যেন প্রতিধ্বনিত করে। মাহীন খুকি ঘুমের ঘোরে যেভাবে বিলাপ করে আর তার মৃত বাবার কাছে না গিয়ে বরং মাকে কাছে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, তাতেও তার বিপন্নতার ইঙ্গিত আভাসিত হয়। তেমনিভাবে বিশেষ কোনো সম্বোধনের মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে 'বালাই, ষাট' উচ্চারণে ফাঁড়া বা বিপদ কেটে যাবার ব্যাপারে প্রচলিত লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্তও রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে কলহ করে প্যাঁকালে কৃষ্ণনগর ছেড়ে রানাঘাটে চলে গেলে তার ভাইপো মাকে বলে, "আচ্ছা মা, ছোট-চা বুঝি বা-জানের কাছে চলে গিয়েছে? উখেনে থেকে বুঝি আর ছেড়ে দেয় না?'... মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে। বলে, 'বালাই! ষাট! উখেনে যাবে কেন?" (রফিকুল, ২০০৭: ৩৩৫) এ সংলাপে লক্ষণীয়, অলক্ষুণে বা অশুভ কথা (বালাই) যেন না ফলে, সেজন্য ষষ্ঠী (ষাট) দেবীর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। হিন্দু সমাজ থেকে এ লোকবিশ্বাস মুসলমান সমাজেও গৃহীত হয়েছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত শিক্ষিত সমাজের বাসিন্দা নাজির হোসেন ও তার স্ত্রী লতিফার সংলাপেও লক্ষণীয়। নাজির তার

দেহের প্রকাণ্ড আকারের দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আহারে সংযমী হবার কথা জানালে "লতিফা নাজির সাহেবের গায়ে থুতকুড়ি দিয়ে কটাস করে রাম-চিমটি কেটে বলে, 'ষাট! বালাই! তোমায় কে মোটা বলে! তার চোখে ভ্যালার আঠা দিয়ে দেবো!" এ সংলাপে কুদৃষ্টি বা খারাপ নজর সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রতিফলনও রয়েছে, যেটিকে লতিফা প্রতিহত করতে চেয়েছে। তেমনিভাবে সনাতনধর্মের দেবী 'লক্ষ্মী'র শ্রীময়ী, কল্যাণী, রুচিশীল ভাবমূর্তির বিপরীতে ব্যক্তির ছন্নছাড়া, কুশ্রী, বাউণ্ডুলে ও এলোমেলো চেহারা-আচরণকে 'লক্ষ্মীছাড়া' হিসেবে সম্বোধনের প্রবণতা মুসলমান সমাজেও গৃহীত। উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে আনসারের প্রথম আগমনের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন — 'লক্ষ্মীছাড়া-মতো চেহারার লম্বা-চওড়া একজন মুসলমান যুবক কোত্থেকে এসে সোজা নাজির সাহেবের বাসায় উঠল।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৪৭) আনসারের বোন লতিফা আলাপকালে তাকে সম্বোধন করেছিল — 'দাদু, লক্ষ্মীটি, এক মাস না দুমাস, কেমন?' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৫৩) সে আনসারের প্রতি বিরূপ হয়ে পরবর্তীকালে বলেছিল — 'তুমি চিনবে না দাদু, তুমি লক্ষ্মীছাড়া।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৫৮) লোকসংস্কৃতির এসব অবস্তুগত উপাদান ব্যক্তির অবচেতনলোকে পুঞ্জীভূত থাকে এবং পরিণতিতে উপযুক্ত পরিস্থিতিসাপেক্ষে প্রকাশিত হয় তার সংলাপে, আচরণে ও ভাবনায়।

১.২ লোকসংস্কার

লোকবিশ্বাসেরই সম্প্রসারিত রূপ লোকসংস্কার, যা প্রাচীনকাল থেকেই লোকসমাজের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। এর সঙ্গে সাধারণত আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদির সংযোগ থাকে। লোকসংস্কার প্রায়শ সামষ্টিক, যদিও ব্যক্তিগত আচরণে লোকসংস্কারের প্রতিফলন লক্ষণীয়। এগুলোর প্রভাব লোকবিশ্বাসের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং সেকারণেই ব্যবহারিক জীবনে যথাসাধ্য মেনে চলার প্রতি লোকসমাজের সতর্কতা বজায় থাকে। মানুষের জীবনচক্রে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে প্রধান ঘটনা। ফলে এসব পর্যায়কে কেন্দ্র করে সংস্কারের প্রচলনও সবচেয়ে বেশি। এগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকে আরো অজস্র গৌণ বা সম্পূরক সংস্কার। সেগুলো মান্য করে মানুষ সৌভাগ্য বা সুফল নিশ্চিত করতে চায় এবং দুর্ভাগ্য প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকে। বাস্তব জীবনে ক্ষয়-ক্ষতি, কলহ, অস্বস্তি প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্য স্থান-কাল-পাত্র সীমার মধ্যে নানা পালনীয় বিধি সংস্কাররূপে প্রচলিত থাকে।

কিরা কাটা, দিব্যি দেয়া, কারো নামে শপথ করা প্রভৃতি ব্যক্তিক আচরণ ক্রমশ সমষ্টিমানসে গৃহীত হলে তাদের ব্যবহারে ও মানসিকতায় এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন এটি লোকসংস্কারের অংশ হয়ে ওঠে। এর মূলে রয়েছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার বা সমীহ করার প্রবণতা, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যকে ভয়

দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। এমনকি আবেগপ্রবণতাবশত কাউকে আয়ত্তে আনার কৌশল হিসেবেও এর প্রয়োগ ঘটে। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে দিব্যি দেয়া, কসম কাটা প্রভৃতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'দুই' পরিচ্ছেদে কলতলায় জল আনতে গিয়ে হিড়িম্বার সঙ্গে প্যাঁকালের মার বিবাদ রীতিমতো সাম্প্রদায়িক বিবাদের রূপ নেয়। অথচ তারাই আবার নিত্যদিনের ওঠাবসায়, বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়ায়। প্যাঁকালের মার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ও একমাত্র মেয়ে পাঁচি সন্তানসম্ভবা অবস্থায় যখন সংকটাপন্ন, তখন সে হিড়িম্বার কাছে ছুটে আসে সাহায্যের প্রয়োজনে। কারণ প্রসূতি মায়ের সন্তান প্রসবের কাজে দাই হিসেবে তার হাতযশ রয়েছে। 'আল্লার কিরে' কেটে সে বিগত দিনের কলহের দায় মেনে নিয়ে সংকোচ প্রকাশ করে এবং এরপর হিড়িম্বাও পূর্বের রেষারেষি ভুলে পাঁচির কাছে ছুটে যায়। 'এগারো' পরিচ্ছেদে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণকারী মধু ঘরামির উঠতি বয়সের মেয়ে কুর্শির প্রতি মুসলমান প্যাঁকালের মান-অভিমানসূচক সম্পর্কের একপর্যায়ে কিরা কাটার প্রসঙ্গ রয়েছে। মেজো-বৌকে তার ধনী দুলাভাই বিয়ে করতে চায় বলে এর প্রতিকারার্থে প্যাঁকালের মা, বোন পাঁচি ও বড় ভাবী মিলেমিশে দেবর প্যাঁকালের সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিয়ে বা নিকা দেবার পরিকল্পনা করে। প্যাঁকালে এ ব্যাপারে অসম্মত হলেও এ ঘটনা কুর্শিও কোনোভাবে জেনে যায়। ফলে প্যাঁকালের প্রতি সে বিরূপ হয়ে উঠলে তাদের প্রণয়বৃত্তান্ত নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। কাজেই নতি স্বীকার করে প্যাঁকালে তাকে বশে আনতে সচেষ্ট হয়। প্যাঁকালে পরিবারের সঙ্গে বিবাদের পরিণতিতে অভিমানবশত কৃষ্ণনগর ছেড়ে রানাঘাটে চলে গেলে এ ঘটনা জেনে কুর্শির মনোলোকে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। কারণ মেজো-বৌয়ের সঙ্গে প্যাঁকালের বিয়ের প্রস্তাব বিষয়ক ঘটনা জেনে সে কষ্ট পেয়েছিল। তাই সেও রেতো কামারের সঙ্গে প্রণয়ের ছলাকলায় মেতে ওঠে। এ বিষয়টি জানতে পেরে বেশ কষ্ট পায় প্যাঁকালে। এর পরিণতিতে বিরহকাতর কুর্শি প্যাঁকালেকে স্মরণপূর্বক দিব্যি কাটে তার প্রত্যাবর্তন অভিলাষে। তাদের তরুণ বয়সের আবেগোন্মত্ত প্রেমের অনুষঙ্গে এ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

শুচিতা ও অশুচিতা সংক্রান্ত লোকসংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার তাগিদ থাকলেও লোকসমাজে এ ব্যাপারটি সচেতন অবহিতি ও মান্যতার অন্তর্গত নয়। বরং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সনাতন ধর্মের কঠোর বর্ণবাদী অনুশাসন। ব্রাহ্মণ্যবাদী বিধানের পরিণতিতে সৃষ্ট চতুর্বর্ণকাঠামো সৃষ্টিতে তিনটি গুণান্বিত মানদণ্ডকে এক্ষেত্রে ভিত্তি করা হয়েছে। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের মানদণ্ডে বর্ণপ্রথার নিম্নধাপে অবস্থানরত শূদ্র ও এ কাঠামোবহির্ভূত শূদ্রতর বা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য হিসেবে অবনমিত সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সনাতন সমাজের তলদেশে অবস্থান গ্রহণে বাধ্য হয়। বর্ণপ্রথা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে জাতের উদ্ভব ঘটায় 'বর্ণসঙ্কর' প্রথাকে দোষ হিসেবে বিবেচনাপূর্বক তাদের সঙ্গে মেলামেশা-ওঠাবসা, সামাজিক যোগাযোগের ওপর নিষেধাজ্ঞামূলক বিভিন্ন

বিধান মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্য অনুশাসনবাদীরা আরোপ করে। এরই পরিণতিতে সনাতন বর্ণ-জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে জল ও অন্ন গ্রহণ-বর্জন, দৈহিক সান্নিধ্য ও স্পর্শ প্রভৃতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন রীতি, প্রথার উদ্ভব সমাজে ঘটে।[১৩] 'ছুৎমার্গ'[১৪] বা স্পর্শদোষ হিসেবেও এ প্রথাটি যে লোকসমাজে টিকে থাকে, *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে এর দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে প্রান্তিক মুসলমান ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পাশাপাশি স্বল্পসংখ্যক হিন্দুও বাস করে। এ উপন্যাসে লেখক সনাতনপন্থিদের বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক প্রসঙ্গকে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। সনাতন সমাজের কিছু রীতি-নীতি প্রতিবেশী মুসলমান ও খ্রিস্টান বাসিন্দাদের সমষ্টিমানসে গৃহীত হয়েছে বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্তঃপ্রবাহের মাধ্যমে। বিভিন্ন মুসলমান পরিবার যে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে পারিবারিক প্রয়োজন ও শিক্ষা গ্রহণ, পরিজন নিয়ে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার তাগিদে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে, সমগ্র উপন্যাসে এ ব্যাপারটি বিভিন্নভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। লেখক যে ব্যাপারটির প্রতি সচেতন ও মনোযোগী, এর দৃষ্টান্ত হিসেবে 'এক' পরিচ্ছেদের প্রায় তিন পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ লক্ষণীয়। চাঁদ-সড়কেরই একটা কলতলায় জল-নেওয়া নিয়ে সেদিন মেয়েদের বিবাদের কারণটি হলো — 'কে একজন ক্রিশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন এক মুসলমান মেয়ের কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৪) যদিও ব্যাপারটি অনিচ্ছাকৃত এবং যারা এ কাজটি করেছে, তারা পরস্পর বন্ধু, এমনকি ইচ্ছা করে তারা এ ঘটনা ঘটায়নি, তবু একে ভিত্তি করেই মুসলমান পাড়ার প্রতিনিধি হিসেবে প্যাঁকালের মা ও খ্রিস্টান পাড়ার প্রতিনিধি হিড়িম্বার কোমর... বাধা... ঝগড়া পরিণতিতে দুই সম্প্রদায়ের রেষারেষি ও অশ্লীল বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। পুঁটের মা ও হিড়িম্বা খ্রিস্টান বিধায় প্যাঁকালের মায়ের সঙ্গে তাদের বিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। কারণ সে হিড়িম্বাকে অপদস্থ করতে বলেছিল, 'হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মতো চর্বি হয়েছে, না লা?' (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৪) এরই ধারাবাহিকতায় হিড়িম্বা 'হারাম' খোরের পাল্টা যুক্তি হিসেবে তাকে অভিযুক্ত করে দুটি কারণে। প্রথমত, প্যাঁকালের মায়ের মৃত ছেলেদের একজন খ্রিস্টান জজ সাহেবের খানসামা, আরেকজন বেয়ারা ছিল বিধায় তাদের কামাই করা রোজগার হারাম। দ্বিতীয়ত, প্যাঁকালের মা নিজেও পাদ্রি রামপ্রসাদ সাহেবের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করত। এর জবাবে প্যাঁকালের মা জানিয়েছিল 'আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো... আমফেসাদ (রামপ্রসাদ) বাবু(র)... বাড়িতে... এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়িতে?' (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৫) সনাতন ধর্মের বর্ণ-জাতি প্রথার অন্তর্গত অনুশাসনের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের হালাল-হারাম ব্যবধান মিলেমিশে জাতি-সম্প্রদায়গত ভেদাভেদকে যে তীব্র করে তুলেছিল, এসব ঘটনার পাশাপাশি নজরুল আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। এসব লোকসংস্কারের নেতিবাচক প্রভাব যে স্বীয় সম্প্রদায়ের গণ্ডি পেরিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদেরও

প্রভাবিত করে, সেটি শুধু তদানীন্তন কালের নয়, বর্তমানের প্রেক্ষাপটেও অনস্বীকার্য সামাজিক বাস্তবতা। জাতপাতের ব্যবধানগত একাধিক প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। শুধু সনাতন জাতপাত ভেদাভেদ নয়, বরং ইসলাম ধর্মের হালাল-হারাম বিধানকেও সুবিধাবাদী মৌলবি-মোড়লেরা পারস্পরিক অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। খ্রিস্টান মিশনারির চাকুরে ডাক্তার ও নার্স মিস জোন্স উপযাচক হয়ে একদিন প্যাঁকালের মার বাড়িতে এসে তার মেয়ে পাঁচির অসুস্থতার চিকিৎসায় সাহায্য করে। ফলে পাড়ায় দ্রুতই গুজব ছড়িয়ে যায় যে মেজো-বৌকে বশে এনে মিশনারীর নারী কর্মীরা মুসলমান পাড়ার মেয়েদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবে। এর ধারাবাহিকতায় মওলানা হজরত পির গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানি সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে এনে ওয়াজ নসিয়তের বন্দোবস্ত করার যাবতীয় খরচ পাড়ার মুসলমান বাসিন্দাদের ওপর আরোপের পাশাপাশি পালিত ছাগল বিক্রি করিয়ে খরচের দায় বাবদ পনেরো টাকা প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্যাঁকালের মায়ের ওপর আরোপিত হয়। নতুবা তাকে সমাজে পতিত হতে হবে। এ 'পতিত' করার বিধান লোকসমাজে 'একঘরে করা' হিসেবেও পরিচিত।

লোকবিশ্বাস যখন লোকসংস্কারের গণ্ডি পেরিয়ে লোকপ্রথার কাঠামোতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্যের হাতিয়াররূপে ব্যক্তি-দলের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হয়ে ওঠে, তা সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে। নজরুল এসব প্রসঙ্গে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন বলেই এ উপন্যাসে বিষয়গুলোকে রূপায়িত করেছেন। উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহের পরবর্তী বৃত্তান্তও তিনি বিবৃত করেছেন। মেজো-বৌ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে কৃষ্ণনগর ছেড়ে বরিশালে চলে যাবার এক বছর পর পুনরায় শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এলে পাড়ার মোড়লের নির্দেশে তাকে খ্রিস্টান ধর্ম ছেড়ে আবারও মুসলমান হতে হয়। কারণ খ্রিস্টানদের হাতের খাবার খাওয়া নাকি মুসলমানদের জন্য হারাম। সেকারণেই খোকার মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত চল্লিশার অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীদের আনতে তাকে এ বিধান মান্য করতে হয়। কারণ মোড়ল তাকে হুশিয়ার করেছিল, "খ্রিস্টানের হাতে আমি বললেও কেউ খাবে না। ... তোর খোকা মরবার সময় পর্যন্ত বিকারের ঘোরে বলেছে, 'মা, তুই খেরেস্তান, তোর হাতের পানি খাব না।" (রফিকুল, ২০০৭: ৩৯০) জাতপাত ব্যবধান, জল-অন্ন গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারটি শিশুদেরও যে প্রভাবিত করে পরিবারে পালিত বিধানের অনুসরণে, লেখক সে পর্যবেক্ষণকেও উপন্যাসে গ্রন্থিত করেছেন। মোড়ল তার কর্তৃত্ব খাটিয়ে জেদি মেজো-বৌকে বশীভূত করতে মনগড়া এসব কথা বলেছে কি না, এ প্রসঙ্গে লেখক কিছু জানাননি। তবে মেজো-বৌকে আবার মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তবেই শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারে মোড়লের অভিলাষের ব্যাপারটি উপন্যাসে স্পষ্টভাবেই বিধৃত। স্বীয় সম্প্রদায়গত পক্ষপাত এর অন্তরালে প্রবলভাবেই সক্রিয়। কেননা এর পরিণতিতে পাড়ার বাসিন্দাদের

নিকট তার আধিপত্য ও প্রতাপ আরো জোরদার হয়। তবে জাতপাতের ব্যবধানগত সংস্কার এ উপন্যাসের শুরুতেই বিবৃত হয়েছে প্যাঁকালের মায়ের সঙ্গে হিড়িম্বার কলহের বৃত্তান্তে। মেজো-বৌ খ্রিস্টান মিশনারির কর্মচারী মিস জোন্সের দেয়া চা-বিস্কুট খেতে পারেনি। তার সঙ্গে আলাপকালে মিস জোন্স জানায়, ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের দেয়া খাবার গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা ইসলাম ধর্মের বিধান নয় এবং তা গ্রহণে মুসলমানদের জাত যায় না। অথচ মুসলমান পাড়ার মোড়ল ও মসজিদের মৌলবি এ ফতোয়া আরোপ করে তাদের ওপর শাসন চালায়, এর ব্যত্যয় ঘটলে জরিমানা আদায় করে। জাতপাতের ব্যবধান, স্পর্শজনিত সাহচর্য পরিহার এবং পারস্পরিক ওঠাবসাগত ভেদাভেদ হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার নেতিবাচক প্রভাব, যা সুবিধাবাদী মৌলবি-মোড়লরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে পাড়ার মুসলমান বাসিন্দাদের আয়ত্তে রাখতে। নজরুল সচেতন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ সমাজবাস্তবতাকে উপন্যাসটিতে রূপায়িত করেছেন।

অভিলাষ পূরণের জন্য একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করা, এর বিনিময়ে প্রার্থনা পূরণে সমর্থ কাউকে সন্তুষ্ট করা ও বদলা উপহারস্বরূপ সাধ্যমতো দান করা প্রভৃতি মানত করার অন্তর্গত। গ্রামীণ-নাগরিক উভয় পরিমণ্ডলেই এ ধরনের লৌকিক সংস্কারের প্রচলন বাঙালি সমাজে বহুকাল ধরেই প্রচলিত। মনের অভিলাষ পূরণের পাশাপাশি কোনো বিপদ বা সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পীর-দরবেশ, ফকির, ঠাকুর, দেব-দেবী ও স্রষ্টার নামে তাদের দরগায় বা মন্দিরে মানত করা হয়। কখনো বা স্রষ্টার নামে মানত করে গরীবদের উদ্দেশ্যে দান করা হয়। এ উপন্যাসে প্যাঁকালের প্রতি পাড়ার বৌ-ঝিদের আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে নিজের মেয়ের জামাই হিসেবে তাকে পাবার জন্য স্রষ্টার উদ্দেশ্যে জোড়া মোরগ নিবেদন করার নিয়তে। এটিও সনাতন ধর্মের বলিদান প্রথার অনুসৃতি। প্যাঁকালেকে মেয়ের জামাই হিসেবে পাবার অভিলাষ যে বিয়ের সম্ভাব্য পাত্রীদের অভিভাবকদের এ ধরনের সংস্কার পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তা থেকেও লেখকের লোকসমাজ সম্পর্কিত সচেতন পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১.৩ লোকাচার

লৌকিক আচার লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। মানবজীবনের বস্তুগত দিকের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ তার কর্মজীবনে এ দুটিকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে। প্রকৃতি এবং দৈবশক্তিকে তুষ্ট রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বস্তুগত কর্মকাণ্ড ফলপ্রসূ হবে, এটিই তার বিশ্বাস। এভাবেই লোকায়ত সমাজে আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রবর্তন ঘটে। বাঙালি লোকসমাজে বিভিন্ন প্রচলিত আচারের অধিকাংশই জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক। মানবজীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি পর্যায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে দুটি লোকাচারের উল্লেখ

রয়েছে। এর একটি গর্ভবতী নারীর আসন্ন সন্তানকে জন্মদান বিষয়ক, অন্যটি মৃত্যুকেন্দ্রিক। প্যাঁকালের একমাত্র ছোটবোন পাঁচি গর্ভধারণ করলে একপর্যায়ে তার আসন্ন সন্তানের জন্মদান উপলক্ষে আয়োজিত সাধভক্ষণের প্রসঙ্গ রয়েছে 'দ্বিতীয়' পরিচ্ছেদে। আর্থিকভাবে দরিদ্র হলেও পরিবারের মা-বা বা অভিভাবকরা সন্তানসম্ভবা নারীকে শ্বশুরবাড়ি বা স্বামীগৃহ থেকে বাপের বাড়ি বা নিজের কাছে এনে রাখে, সাধভক্ষণের আচার পালনের জন্য। 'মেয়ের প্রথম সন্তান পিত্রালয়েই হয় – এ-ই দেশের চিরাচরিত প্রথা। অতি বড় দুঃখীও তার মেয়ে প্রথম সন্তান-সম্ভাবিতা হলে নিজে গিয়ে মেয়েকে আনে, ...'সাধ' খাওয়ায়।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৮) তবে পাঁচিকে কেউ সাধভক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়নি বা সেধেও আনেনি। তার স্বামী আরেক নারীকে বিয়ে করায় সে অভিমানবশত স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে আসে। নিজ পরিবারে আর্থিক অনটন প্রবল বিধায় কেউ তার সাধভক্ষণের বন্দোবস্ত করেনি। পাঁচির ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার সময় প্যাঁকালে বাড়িতে ছিল না। কাজ শেষে সে বাড়িতে ফিরে গোসল সেরে নবজাতককে দেখতে চাইলে প্যাঁকালের মা তাকে জানায়, খালি হাতে নবজাতককে দেখতে নেই। এ লোকাচারের মূলে রয়েছে আনন্দযোগের বৃত্তান্ত। নবজাতককে পরিবারে বরণ করে নেয়ার অনুষঙ্গে উপহার প্রদানের ব্যাপারটি এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে প্যাঁকালের পক্ষে নবজাতককে দেখার সাধ অপূর্ণই থেকে যায়। কারণ পাঁচির ছেলেকে দেখার জন্য উপহার দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি তার তখন ছিল না। "প্যাঁকালে নিজের রিক্ততায় সঙ্কুচিত হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা কাল কিংবা আর একদিন দেখব এসে। আমার–শালার-মনেই ছিল না যে, শুধু হাতে দেখতে নেই।" (রফিকুল, ২০০৭: ৩১৮)

১.৪ লোকসাহিত্য

আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সৃষ্টিশীলতার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের অনুপ্রেরণা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মূর্ত হয়। স্বল্পশিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর হয়েও অন্তর্গত সম্ভাবনা ও মেধার সমন্বয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির সহজাত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবন ও প্রকৃতিসংলগ্ন দিনযাপনের অভিজ্ঞতা লোকসমাজের বাসিন্দারা বিভিন্ন মাধ্যমে সৃজনে সচেষ্ট থাকে। এ উপন্যাসে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ প্রযুক্ত হয়েছে, যা লোকসমাজের বাসিন্দাদের ভাবনা ও মনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করে। বলাবাহুল্য, লোকসাহিত্য একদিকে যেমন তাদের মৌলিক ভাবনা ও কল্পনাশক্তিকে রূপায়িত করে, অন্যদিকে তা তাদের চিত্তবিনোদনের জোরালো মাধ্যম হিসেবেও স্বীকৃত। বহুকাল যাবত বংশপরম্পরায় মৌখিকভাবে রচিত এবং নিত্যদিনের আলাপে, সম্ভাষণে প্রচলিত বিভিন্ন লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত ও পুথিসাহিত্যে প্রতিফলিত হয় তাদের গোষ্ঠীচেতনা, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ, পারিবারিক অনুশাসন ও নৈতিকতা, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন অনুষঙ্গ।

লোককথা

স্বামীর অর্ধেক রাজত্বে পাঁচির মন উঠল না। (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৮)

হিড়িম্বা হেসে বলল, 'ভয় কি তোর মা; এই তো এখনি সোনার চাঁদ ছেলে কোলে পাবি! (রফিকুল, ২০০৭: ৩১০)

চাল-ডালের মধ্যে একটা বোয়াল মাছ দেখে তারা একযোগে চিৎকার করে উঠল। যেন সাপের মাথায় মানিক দেখেছে। (রফিকুল, ২০০৭: ৩১৮)

একটা আঁধার রাত যেন ডাইনির মতো শিস দিয়ে ফেরে। (রফিকুল, ২০০৭: ৩৪১)

গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ, যেন কোনো সর্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রতপ্ত আঁখি। (রফিকুল, ২০০৭: ৩৪৩)

প্রবাদ

যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। (রফিকুল, ২০০৭: ৩২৩)

সাবধানের মার নেই। (রফিকুল, ২০০৭: ৩৬৮)

দুধ খাওয়ার সাধই যদি জেগে থাকে, এ ঘোল খেয়ে খামকা সর্দি করছ কেন?' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৮৩)

যদি বেশি টানে দড়ি ছিঁড়ে যায়। (রফিকুল, ২০০: ৩৮৯)

ছড়া

বৌ পালালো বৌ পালালো খুদের হাঁড়ি নিয়ে,
সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে। (রফিকুল, ২০০৭: ৩১৭)

'যাদু আমার লাঙল চষে, দুধারে তার কাল গরু,
যাদুর বেছে বেছে বিয়ে দিব পেট মোটা মাজা সরু।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩২২)

লোকসংগীত

ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,
হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল! (রফিকুল, ২০০৭: ৩১২)

কত আশা করে সাগর সেঁচিলাম
মানিক পাবার আশে,
শেষে সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগিনীর কপাল-দোষে। (রফিকুল, ২০০৭: ৩২১) ...

বাগধারা

আচ্ছা মা যাহোক বাবা তুই! আমরা হলে ধন্না দিয়ে পড়তাম।
(রফিকুল, ২০০৭: ৩০৯)

তার বোন মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে কি একটা মতলব ঠাওরায়। (রফিকুল, ২০০৭: ৩১৯)

যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনি ছাই-পাশ নৈবেদ্যি। (রফিকুল, ২০০৭: ৩২০)

> অন্যদিন বৌ এইরকম কথা বললে সে হয়তো লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে তুলত। (রফিকুল, ২০০৭: ৩২৪)
>
> রায়-বাঘিনী শাশুড়ি সে, বৌদের কথায় কথায় 'নাকের জলে চোখের জলে' করে। (রফিকুল, ২০০৭: ৩২৪)

১.৫ লোকক্রীড়া

ক্রীড়া বা খেলাধুলা একটি অতি প্রাচীন সামাজিক ক্রিয়া। বস্তুতপক্ষে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে ক্রীড়া অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আদিম মানুষ তার বাঁচার তাগিদে দৌড়, ঝাঁপ, গাছে চড়া, পাথর ছোড়া, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি কাজে অভ্যস্ত ছিল। উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়াসে সে প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, যা ছিল তার বেঁচে থাকার অবলম্বন, উন্নত অবস্থায় এ ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন কমে যায়। কিন্তু বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী সেগুলোই লোকক্রীড়া হিসেবে প্রচলিত হয়। এ উপন্যাসে কিছু লোকক্রীড়ার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো, পুতুল খেলা, মোরগ-লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো, বৌ-পালানো খেলা প্রভৃতি। উপন্যাসের শুরুতে এবং শেষপর্যায়ে মাটির পুতুলের উল্লেখ লক্ষণীয়, যা কৃষ্ণনগরের লোকশিল্পের অনন্য নিদর্শনও বটে। বালক-বালিকাদের পুতুল খেলার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় জীবনের বিশাল রঙ্গমঞ্চে মানবজীবনের প্রবহমানতা এ উপন্যাসে ভিন্নতর অর্থদ্যোতকতায় সম্প্রসারিত। কারণ যেসব কুশীলব এ উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত, তারা সবাই যেন এক অর্থে মাটির পুতুল। তাদের কাছে এ পুতুল শিল্পের আধার নয়, বরং খেলার সামগ্রী। জীবনের নান্দনিক ভাবনা, পারিপাট্য, রুচিশীলতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বহুলাংশেই দ্বন্দ্বাকীর্ণ। কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়ক এলাকার লোকসমাজের দারিদ্র্যময় জীবন সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক শাসনে তাদের নিষ্পেষিত হওয়ার মর্মন্তুদ বেদনা এবং এরই ধারাবাহিকতায় প্রজন্মান্তরে টিকে থাকার নিরন্তর লড়াইয়ের বৃত্তান্তে লেখক সমষ্টিমানুষের পরাভূত মনোভঙ্গিকে যেন পুতুলের নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে আভাসিত করেছেন উপন্যাসের শুরুতে —

> পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর।
>
> যেন কোনো খেয়ালি শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।
>
> খোকার চলে-যাওয়া পথের পানে জননীর মতো চেয়ে আছে — খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে। (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৩)

উপন্যাসের 'বাইশ' পরিচ্ছেদে 'সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৭৩) বাক্যাংশে বামপন্থি নেতা আনসারের কৃষ্ণনগর থেকে গ্রেফতার হওয়ার পরিণতিতে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দাদের অসহিষ্ণু মনোভঙ্গি ও জীবনের বিরূপতাকেই লেখক বাঙ্ময় রূপ দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের পাকচক্রে তাদের অবরুদ্ধ জীবনের গ্লানি ও পরাধীনতার নীরব হাহাকার এ বাক্যাংশে লেখকের

বেদনাবোধকেই সুতীব্র করে তোলে। চাঁদ-সড়কের বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রচলিত ক্রীড়ার মধ্যে রয়েছে ঘুড়ি ওড়ানো,[১৫] মোরগ-লড়াই এবং বৌ-পালানো খেলা প্রভৃতি। ছড়া কাটা, গান গাওয়া, অভিনয় প্রভৃতির সমবায়ে এসব লোকক্রীড়া বালক-বালিকাদের চিত্তবিনোদনের অবলম্বন হয়ে ওঠে।

১.৬ লোকপ্রযুক্তি

মানুষ জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবসভ্যতার বিকাশ সাধন করেছে। এর মূলে আছে মানবজীবনকে প্রতিনিয়ত সুখকর, সমৃদ্ধ, উন্নত ও নিরাপদ করে গড়ে তোলার প্রয়াস। মানুষ অভাব ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে তাদের লৌকিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাপনের উপযোগী নানা বস্তু, যন্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি করে আসছে। এ উপন্যাসে লোকসমাজের প্রাত্যহিক জীবনে লোকপ্রযুক্তির কিছু প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, সাজসজ্জায় আগ্রহী প্যাঁকালে আয়না কিনতে চাইলেও অর্থাভাবে তা কেনা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে। কাজেই মাথায় তেল দিয়ে সিঁথি কাটতে সে একটি থালায় জল ঢেলে এতে নিজের প্রতিবিম্বিত অবয়ব দেখে কাজ চালিয়ে নেয়। কুর্শি ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতে সাবানের অভাবে সাঁজি মাটি দিয়ে সেগুলো সিদ্ধ করে পুকুরে ধোয়। রেতো কামারের কর্মকৌশলে লোকপ্রযুক্তি আংশিক আভাসিত হয় — 'রেতো তার হাঁপর *ঠেলতে ঠেলতে*... প্রাণপণে হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটায়... ফলাটা আবার আগুনে সেঁক দিয়ে হাঁপর *ঠেলতে ঠেলতে* বলে...' (রফিকুল, ২০০৭: ৩৩২)। এছাড়া লোকপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে রয়েছে। অতীতে ঘোড়ার গাড়ি লোকযান হিসেবে প্রচলিত থাকলেও দিনবদলের ফলে ঘোড়ার গাড়ি অর্থসম্পন্ন ব্যক্তির আভিজাত্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হয়ে ওঠে। মেজো-বৌয়ের দুলাভাই কলকাতার ধনাঢ্য চামড়া ব্যবসায়ী। সে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে শ্বশুরবাড়িতে আসে। তবে যাত্রী বহনের কোনো দৃশ্যের বর্ণনা না থাকলেও কুর্শি ও পাঁচির প্রণয়লগ্ন পরিবেশে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের আকস্মিক উপস্থিতি কীভাবে তাদের ভাবাবেশে তালভঙ্গ ঘটায়, সেই কৌতুককর পরিস্থিতি বর্ণনা উপন্যাসের 'তিন' পরিচ্ছেদে রয়েছে।

১.৭ লোকভাষা

লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে লোকভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর ভাষা[১৬] বৈচিত্র্যময়, যার নেপথ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সমন্বিত অভিঘাত। ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মৌলিক বাহন। তবে এর ভূমিকা শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ লোকসমাজের ভাষাভঙ্গি নিছক বাচিক নয়। ফলে অভিনয়, ইশারা, অঙ্গভঙ্গি, প্রতীক-রূপক অনুষঙ্গ, প্রবাদ-বাগধারা, বিভিন্ন ধরনের শব্দের মিশ্রণে লোকভাষা

বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করে। কৃষ্ণনগরের লোকমানুষের মুখের ভাষাকে সফলভাবে ব্যবহারে *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসে নজরুলের পারদর্শিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সরস, গতিময় ও প্রাঞ্জল এ ভাষার ব্যবহারে নজরুলের সহজাত পারদর্শিতা উপন্যাসটির কুশীলবদের ভাষিক পরিমণ্ডলকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে রূপায়ণে কৃতিত্বের দাবিদার। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা এবং লোকমানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষাকে তিনি এ উপন্যাসের কুশীলবদের সংলাপে অনায়াসেই সংযুক্ত করতে পেরেছেন। সমাজের তলদেশবর্তী মানুষের ভাষাভঙ্গিতে ও দেহভঙ্গিমায় (বডি ল্যাংগুয়েজ) যে তাদের আবেগ-অনুভব, সংবেদনা, রাগ, ক্রোধ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও মনোভাবনা অকৃত্রিমভাবে ফুটে ওঠে, এর দৃষ্টান্ত এ উপন্যাস। নজরুল অত্যন্ত সচেতনভাবে চরিত্রসমূহের সামাজিক অবস্থান, শ্রেণি-পেশাগত সম্পর্ক, লৈঙ্গিক পরিচয় ও বয়সভেদে তাদের সংলাপকে গ্রন্থিত করেছেন বিশেষ ভঙ্গি, ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। ধর্মশাসিত রক্ষণশীল মনোভঙ্গি ও ভাববৃত্তিগত পরিমণ্ডলের প্রতিনিধি হিসেবে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্যদিনের আলাপ ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সমাজের বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ, বাগধারার উপস্থিতি, অঙ্গভঙ্গি ও আঞ্চলিকতার প্রভাব এ উপন্যাসের লোকভাষাকে বিশিষ্ট মাত্রায় উন্নীত করেছে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসমূহ নিম্নরূপ —

> ক. নকড়ি ডাক্তার নাড়ি দেখে বললেন, 'অবস্থা বড় ভালো ঠেকছে না রে, হার্টফেল করার বড্ডো ভয়।'... মেজো-বৌ ইশারায় প্যাঁকালেকে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আচ্ছা বেঁহুশ ডাক্তার তো, রোগীর কাছে তার অবস্থা এমনি করে বলে নাকি?'... নকড়ি ডাক্তার বোধ হয় ততক্ষণে মেজো-বৌয়ের ইশারার মানে বুঝে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে প্যাঁকালেকে ডেকে বলল, 'ওরে, তোদের বাড়ি মুরগির বাচ্চা আছে তো? একটু ঝোল করে খাওয়া দেখি। এখখুনি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ভাবিসনে কিছু, ও ভালো হয়ে যাবে 'খন'। বলেই হাই তুলে দুটো তুড়ি মেরে মেজো-বৌয়ের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন গিলে খাবে! মেজো-বৌ একটু হেসে হেঁসেল ঘরে সরে গেল। বড়-বৌ বলে উঠল, 'কি লা হাসছিস যে বড়!'... মেজো-বৌ ডাক্তার শুনতে পায় এমনি জোরেই বলে উঠল, 'আখার বাসি ছাইগুলোর কিনারা হল দেখে। (রফিকুল, ২০০৭: ৩২০-৩২১)

> খ. গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলচে, 'হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মতো চর্বি হয়েছে, না লা?... গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা বলবি বৈ কি লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা!'... গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসির সবটা জল মাটিতে ঢেলে ফেলে আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'ওলো আগ-ধুমসী (রাগধুমসী)! ওলো ভাগলপুরে গাই! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো'.., পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার

আর তর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে উঠল, 'আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি!' (রফিকুল, ২০০৭: ৩০৪-৩০৫)

গ. প্যাঁকালে কটু কণ্ঠে বলে উঠল, 'ঐ শালা ন্যাড়া গয়লা–শালা গান করছে না তো, যেন হামলাচ্ছে।'... সকলেই হেসে উঠল।... হঠাৎ ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'খড়গ পাচে।'... অমনি সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে ঐ ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করলে তার গা টিপে আর একজন আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় রে?'... অদূরে সাইকেল রেখে এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারেই একটা অপকর্ম করতে বসে গেছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্যাঁকালে বলল, 'উ-ই যে, নীল চোঁয়ায়।' (রফিকুল, ২০০৭: ৩১৩)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে নকড়ি ডাক্তার ও মেজো-বৌয়ের পারস্পরিক আলাপ পরোক্ষ রীতিতে এগিয়েছে, যেখানে মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্যাঁকালেকে উভয়ের ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। মেজো-বৌকে দেখে নকড়ির মনোযোগ রোগীর দিকে ধাবিত না হওয়ায় সে হাস্য-ব্যঙ্গ-পরিহাসযোগে ডাক্তারকে মৌখিকভাবে বশীভূত করতে সচেষ্ট। বড়-বৌ ও প্যাঁকালেকে শুনিয়ে ডাক্তারকে শ্লেষের চাবুকে বিদ্ধ করতে মেজো-বৌ পটু। এ উদ্ধৃতিভুক্ত শানিত বাক্যরাশির অন্তর্গত গতিময়তা ও বক্তব্যের অভিমুখ কুশীলবদের পারস্পরিক মনোভঙ্গি নির্দেশক। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্রান্তিক নারীসমাজের কলহচিত্রে প্রমূর্ত ক্রোধ, অপমান, ঈর্ষা ও প্রতিশোধস্পৃহা উদ্গীরণের অবলম্বন হয়েছে অপভাষা ও মেয়েলি বাচনভঙ্গি, তাদের দেহভঙ্গিমা। অশ্রাব্য গালি, কদর্য ছড়া ও শানিত বাক্যবিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে কাবু করার জীবন্ত দৃশ্যমালা এ উদ্ধৃতিতে পরিস্ফুট। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে প্যাঁকালে ও তার সঙ্গীদের আলাপে দলগত গুপ্ত ভাষার মাধ্যমে (গোপন ভাষা বা কোড-ল্যাংগুয়েজ) অন্যদের নিকট আড়াল করা বক্তব্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। যে বাড়িতে তারা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, সে বাড়ির মালিককে রাস্তার পাশে প্রাকৃতিক তাড়নায় সাড়া দিতে দেখে, সেটি এভাবেই তাদের আলাপের বিষয় হয়ে ওঠে।

শব্দভাণ্ডার

বিশেষ্য — কুদুলি, টিপ্পনি, পিলে, ধুমসুনি, খেদ, গয়লা, ধুলো, কোল, কচা, বলদ, কাতুকুতু, বাছা, ছুঁড়ি, ড্যাকরা, খুদ, গোবর, চেঁচাড়ি, ফ্যান, মিনসে, ঢিল, খ্যাংরা, কলসি, উনুন, হাঁড়ি, চটি, পেটলা, চাল, খাঁড়া, কোচর, গামছা, বিড়ি, নিমা, বেড়া, বড়শি, ঘড়া, বাটি প্রভৃতি।

বিশেষণ— ধুমখাত্তর, পাকা, উসখুস, ধড়ফড়, ক্ষুরধার, থ্যাবড়ানো, চেকনাই, নাদুস-নুদুস, ধপাস, গোলগাল, কালোকুলো, বাড়ন্ত, পোড়ারমুখী, ঝলমল, কচি, চাঙ্গা, সরগড়, ঝিলমিল, ঝলসে, চিৎপাত, নেওটা, হাবুডুবু, মুখপোড়া, ঠিকরে প্রভৃতি।

ক্রিয়া — ভানে, ঠেঙায়, কুড়োয়, ফেললে, চিবিয়ে, ঠুঁকে, দুলিয়ে, খিঁচিয়ে, বাঁধে, চিতিয়ে, খিদে, লুটিয়ে, ধড়ফড়িয়ে, ভানতে, ছেঁকে, কোটে, ঝাঁকানি, পিষে, ভ্যাঙচাচ্ছে, তড়পেছে, খুঁড়তে, বিষিয়ে, বেঁকিয়ে, কেড়ে, মার, ছুঁড়ছে, ভেসে, ধড়ফড়িয়ে, হুটেপুটি প্রভৃতি।

শব্দদ্বৈত — চিবিয়ে চিবিয়ে, চুপি চুপি, কাঁদতে, কাঁদতে, পুড়তে পুড়তে, গুণ গুণ, সেকতে সেকতে, মারতে মারতে, নিকুতে নিকুতে, আমতা আমতা, মাখতে মাখতে, নিবু নিবু প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি — ভদ্রলোক>ভদ্দর-নুক, লজেন্স>লজঞ্চুস, অনাসৃষ্টি>অনাছিষ্টি, হাড়>হাড্ডি, খ্রিস্টান>খেরেস্তান, রাজা>আজা, উনুন>রুনুন, ব্যারাম>ব্যায়ারাম, গিয়েছিলাম>গিয়েলাম, প্রোটোস্ট্যান্ট>ছিটেন, হয়েছিল>হয়েলো, নাঠে>লাচে প্রভৃতি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানীরা বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে লোকসংস্কৃতি চর্চার নতুন ক্ষেত্র হিসেবে নগরকে চিহ্নিত করেছেন। ফোকলোর চর্চার শুরু থেকে প্রায় সোয়াশো বছর পর্যন্ত শুধু গ্রামীণ পরিমণ্ডলকেই লোকসমাজের ও লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ নজরুল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগেই দেখিয়েছিলেন, বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নগরের যোগাযোগ বিভিন্নভাবে গড়ে উঠছে এবং লোকসমাজের গড়ন ও প্রবণতা কালের ধারাবাহিকতায় নতুন রূপ ধারণ করছে। প্রান্তিক-অবহেলিত মানুষের প্রতি একাত্মতাবোধ এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রত্যাশা নজরুলের সামগ্রিক শিল্পসৃষ্টির প্রধানতম অবলম্বন। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের বিষবাষ্প সর্বভারতীয় জনমানুষকে যুগ যুগ ধরে যেভাবে পদদলিত-অবরুদ্ধ করেছে। এর বিরুদ্ধে নজরুলের সমকালে বা পরবর্তীকালে তাঁর মতো বজ্রকণ্ঠে কোনো কবি, সাহিত্যিক অকৃত্রিমভাবে লেখনী ধারণ করেননি, এমনকি তাঁদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম হননি। লোকমানুষের প্রতি তাঁর অনুরাগ, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভালোবাসার রূপায়ণ *মৃত্যুক্ষুধায়* অনবদ্য ভাষ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্বভাবগত আগ্রহ ও সচেতনতা, পর্যবেক্ষণশীল জীবনদৃষ্টি ও নতুনত্বের প্রতি প্রবল আগ্রহই নজরুলের এ উপন্যাস রচনার মুখ্য অবলম্বন। বাংলার নাগরিক লোকসংস্কৃতিবিষয়ক উপন্যাসের ভুবনে *মৃত্যুক্ষুধা* পথিকৃতের ঐতিহাসিক মর্যাদায় উচ্চাসীন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. 'নাগরিক লোকসংস্কৃতি'র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'urban folklore'। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসংস্কৃতিবিদ এটিকেই গ্রহণ করেছেন প্রাসঙ্গিক আলোচনাক্ষেত্রে। তবে বরুণকুমার চক্রবর্তী এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'শহুরে লোকসংস্কৃতি' অভিধা ব্যবহার করেছেন। ('শহুরে লোকসংস্কৃতি', *লোকসংস্কৃতির সাতকাহন*, বিশ্বসাহিত্য ভবন,

ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৪) সৌমেন সেন 'urban folklore'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'City-lore' শব্দবন্ধের উল্লেখ করেছেন। ['নাগরিক লোকসংস্কৃতি', সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *লোকজ সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ২০] শেখ মকবুল ইসলাম 'নগর-ফোকলোর' অভিধাটি ব্যবহারের পাশাপাশি বিকল্প যেসব অভিধার উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো 'নগর পরিসরের ফোকলোর', 'নগরত্ব ও ফোকলোর', 'ফোকলোরের উপরে নগরের প্রভাব', 'সিটি লোর' প্রভৃতি। (সৌগত চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬) নাগরিক লোকসংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে বরুণকুমার চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিক অভিমত —

Urban Folklore কথাটির চল বর্তমানে।... Urban Folklore বা 'শহুরে লোকসংস্কৃতি'তে আপাতভাবে এক ধরনের স্ববিরোধিতার সন্ধান লভ্য।... যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ এখন অনেক বেশি নিবিড়। ফলত লোকজ সংস্কৃতির পরিচয়ে পরিচিত মানুষ শহরে বাস করেও এমন অনেক কিছুই পালন করেন, মানেন, বিশ্বাস করেন, আচরণ করেন যা আর যাই হোক অবিমিশ্র শহুরে সংস্কৃতি নয়। দ্বিতীয়ত, লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোনো সূত্রে গ্রামের মানুষ শহরবাসী হতে পারেন, হনও। তাঁরা গ্রামের লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক কিছু যেমন ত্যাগ করে আসেন, তেমনি কিছু কিছু আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসেন, সম্পূর্ণভাবে সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেন না। তৃতীয়ত, এখন যারা শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাদের অনেকের বাল্য, কৈশোর কিংবা যৌবনের অনেকখানি সময় কেটেছে লোকজ সংস্কৃতির বাতাবরণে। স্বভাবতই মজ্জাগত সেই সংস্কৃতির প্রভাবের রেশ শহুরে জীবনেও আত্মপ্রকাশ করে।... প্রশ্ন হল, তাহলে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোরের সঙ্গে কি শহুরে লোকসংস্কৃতি বা আরবান ফোকলোরের কোনো পার্থক্য নেই? আছে। নিশ্চয়ই আছে। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি আঞ্চলিকতার পরিচয়বাহী, কিন্তু আরবান ফোকলোরের আঞ্চলিকতার সঙ্কীর্ণ পরিচয়ে আবদ্ধ থাকে না। তার গ্রহণযোগ্যতা, অনুসৃতি বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি দীর্ঘ ঐতিহ্যাশ্রিত, সে তুলনায় শহুরে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব অল্পদিনের। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের দাবী করতে পারে না। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধারক বাহকরা মূলত কৃষিজীবী, কিন্তু শহুরে লোকসংস্কৃতির যারা পৃষ্ঠপোষক তারা কখনই কৃষিজীবী নয়। অন্য নানা জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগ। শহুরে লোকসংস্কৃতিতে প্রকৃতির ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির পালকরা মূলত নিরক্ষর কিন্তু অশিক্ষিত নন। শহুরে লোকসংস্কৃতির ধারকরা মূলত সাক্ষর এবং এক ধরনের আত্মম্ভরিতা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে, বলা যায় Superiority Complex; গ্রামীণ মানুষের মতো হীনমন্যতার শিকার নন। (বরুণকুমার, ২০০১: ৫৪-৫৫)

সৌমেন সেনের অভিমত —

নাগরিক লোকসংস্কৃতি বা Urban Folklore ev City-lore সম্পর্কে ভাবনা ও আলোচনা খুব পুরোনো নয়।... লোক ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে... উনিশ শতকীয় ধারণার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি বিশশতকে পৌঁছেও। অন্যরকম ভাবনা শুরু হয়

ঐ দশকের তিরিশের দশক থেকে। যদিও নাগরিক লোকসংস্কৃতি নামে একটি স্বতন্ত্র ধারার কথা তখনও শোনা যায়নি। শুধু বলা হয় যে, লোক ও লোকসংস্কৃতি শুধুই গ্রামীণ নয়; শহরের কলকারখানার শ্রমিকরাও 'লোক' এবং তাঁদের সংস্কৃতিও 'লোকসংস্কৃতি'।... লোকসংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ধারা নাগরিক লোকসংস্কৃতি।... এই সচেতনতার শুরু গত শতকের ষাটের দশকে যখন আবার 'লোক'-এর সংজ্ঞাও পালটাল।... এই সচেতনতার উল্লেখ পাই আমেরিকার লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যালান ডান্ডিসের একটি লেখায় (যিনি প্রথম 'লোক'-এর একটি বিকল্প সংজ্ঞা প্রস্তুত করেন) অবশ্য কাছাকাছি সময়ে জার্মানিতে হার্মান বসিংগার আধুনিক প্রযুক্তি ও নগর সভ্যতার যুগে লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন ১৯৬১ সালে প্রকাশিত একটি বই-এ, যার অনুবাদ আমরা পাই ১৯৯০-এ। ডান্ডিস লিখলেন, যদি আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদরা উনিশশতকীয় ধারণাগুলি মেনে নেন, অর্থাৎ এই সংস্কৃতি শুধুই গ্রামীণ নিরক্ষর পশ্চাৎপদ কৃষকদেরই সংস্কৃতি, তাহলে শিগগিরই তাঁরা দেখবেন যে তাঁদের চর্চা হবে অতীতচর্চা আর তাঁদের শাস্ত্র হবে বিলুপ্ত, কারণ এটা তো সম্ভব যে কালক্রমে কৃষকরাও নগরের কিংবা নাগরিক প্রভাবের আওতায় এসে পড়তে পারেন। আশ্চর্যের কিছু না — গণমাধ্যমের, যেমন ট্র্যানজিস্টার, রেডিও, সিনেমা ইত্যাদির প্রভাবে ইতিমধ্যেই তো খাবারদাবার, ভাষা, পোশাক, ইত্যাদি অনেকটাই পাল্টে গেছে। কিন্তু যদি আমরা 'লোক'-কে নতুন দৃষ্টিতে দেখি, তখন জানব যে 'লোক-এর বিনাশ নেই, যেমন নেই 'লোকসংস্কৃতি'র। আমরা দেখতে পাব আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপে (তথাকথিত উন্নত অগ্রসর দেশগুলিতে) তা এখনো বেঁচে আছে, আর তৈরি হচ্ছে নতুন লোকসংস্কৃতি। তেমনই ঘটবে অন্যান্য দেশে, নগরায়ণের সূত্রে।... এই সচেতনতা থেকেই জন্ম নিল নাগরিক লোকসংস্কৃতির ধারণা। এই ধারণা স্পষ্ট হওয়ার আগেই, আবিষ্কার হয় যে 'লোক' শুধু গ্রামীণ কৃষিজীবীরাই নন, শহরের, কলকারখানার শ্রমিকরাও 'লোক'। এই ধারণা প্রচারিত হয়, 'লোক'-এর পরিধি বাড়ে, বিশশতকের গোড়া থেকে, বিশেষত তিরিশের দশক থেকে, যখন রাশিয়ার মার্কসবাদী লোকসংস্কৃতিবিদরা এই ধারণা প্রচার করেন। পরে তা মেনে নেন অ-মার্কসবাদী পণ্ডিতরাও।... এই ধারণার উৎপত্তি একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ-এর সূত্রে সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়।... তৈরি হল নতুন লোকসংস্কৃতি।... এই সময়েই তৈরি হল লোকসংস্কৃতিচর্চার একটি নতুন তত্ত্ব, Folklorizm তৈরি করলেন রুশ লোকসংস্কৃতিবিদ মার্ক আজাতভস্কি। মার্কসবাদী তত্ত্বের অনুসরণে, শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্র ও সংঘবদ্ধ করার কাজে, সমাজবাদী সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে, ব্যবহার হল লোকসংস্কৃতির, তৈরি হল পুরোনো উপাদান ভেঙে নতুন উপাদান।... নতুন পরিমণ্ডলে, পরিবর্তিত পরিবেশে... তৈরি হয়... 'নাগরিক লোকসংস্কৃতি।' (সৌমেন, ২০২১: ২০-২২)

২. তুষার চট্টোপাধ্যায়, *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*, এ মুখার্জী অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৪২-৪৩

৩. এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো — *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, Maria Leach (edited), Funk and Wagnalls Company, America, 1949 (in 2 volume)

৪. মযহারুল ইসলামের অভিমত —

লোক কথাটি বুঝতে হবে লোকের চারিত্র্যে, তার কার্যকলাপে — তার সামাজিক অবস্থান অথবা বাসস্থানের ভিত্তিতে নয়।... ফোক তারাই যারা সুদূর অতীত অর্থাৎ আদিম কাল থেকে ফোকলোর সৃষ্টি করে এসেছে এবং এখনো সৃষ্টি করে চলেছে... লোক কোনো নির্দিষ্ট স্তরের মানুষ নয় — সমাজের যে কোনো স্তরে লোক বাস করতে পারে... শহরে, নগরে বা গ্রামে সে থাকতে পারে... ফোক যেমন একটি গণগোষ্ঠী হতে পারে, একটি বিশেষ সমাজবদ্ধ শ্রেণী হতে পারে, একটি বিশেষ ভাষার ও সংস্কৃতির বলয়ে আবদ্ধ সমাজ হতে পারে, তেমনি হতে পারে একটি দল বা গ্রুপ। এমনকি ভাবের আদান-প্রদানকারী একটি পরিবারও ফোক — তারাও ফোকলোরের সৃষ্টি করতে পারে, লালন করতে পারে এবং... হস্তান্তর করতে পারে। (২০১২: ৮-১১)

৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মন্তব্য —

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়। (২০০৯: ৮৪)

৬. নিজের সাহিত্যচর্চার আদর্শ ও ভাবনা প্রসঙ্গে নজরুল জানিয়েছেন —

যাঁদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সেখান থেকেই তাদের সাহিত্য আরম্ভ করুন। স্থায়ী সাহিত্য চাই।... আজকাল জনসাধারণের জন্য দরদ জেগেছে সবার মধ্যে। কত রকম 'ইজম'-এর মতবাদ এর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, তাদের এই দরদ যদি সত্যিকারের প্রাণের দরদ হয় তবেই মঙ্গলের। বাহির থেকে দরদ দেখালে বিশ্বাস করে না। তাদেরই একজন হতে হবে।... আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজনীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জন-সাহিত্যের জন্য সাধারণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব তাদের সম্বন্ধে না জানলে কি ক'রে চলে? (উদ্ধৃত, রাজিয়া: ৪০-৪১)

৭. সমালোচকের অভিমত —

নজরুলের ছেলেবেলা কেটেছে রাঢ় বাংলার রাঙা মাটির দেশ চুরুলিয়ার কাজী পল্লীতে।... নজরুল বাল্যকালে ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির। তাঁর বাউণ্ডুলে স্বভাব ও অস্থিরপন্নমতিত্বে পাড়া-পড়শি সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। বালক দুখু বড় হচ্ছেন আর দুরন্তপনা এবং বাউণ্ডুলে ভাব বেড়ে চলেছে।... নজরুলের বয়স যখন আট বছর, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর বাবা ফকির আহমদ মারা যান ১৩১৪ সালের ৭ই মার্চ।... নজরুলের মা ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে পড়লেন মহাসমস্যায়। সংসারে ভরণ পোষণে দেখা দিল সংকট। সংসারের চাহিদা মেটাতে মৌলবী শিক্ষক কাজী ফজলে আহম্মদের আনুকূল্যে নজরুল ঐ স্কুলে এক বছর শিক্ষকতার সুযোগ লাভ করেন।... তারপর সেখানে ইতি টেনে নতুন পথের সন্ধান।... যেন তিনি উন্মাদগ্রস্ত — আনমনা — সেই সময় তিনি সকলের সঙ্গে কম কথা বলতেন — বাল্যেই তার 'তারাক্ষ্যাপা' নামের এখানেই সার্থকতা। এই সময় তিনি লৌকিক

ভাবধারায় এত বেশী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, গ্রামে কোথাও রামায়ণ, মহাভারত ভাগবত, পুরাণ পাঠ কীর্ত্তন, কথকতা হলে ছুটতেন হিন্দু পাড়ায় — তন্ময় হয়ে শুনতেন সেসব অমৃতবাণী — কেউ তাকে বাধা দিত না।... সাধু-সন্ত এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন তাঁদের কাছে। গল্প করতেন, খুব নিকট থেকে অনুধাবন করতেন তাদের সাধন-ভজন এবং নিজের ব্যক্তি জীবনেও সেগুলির প্রয়োগ করবার চেষ্টা করতেন।... চুরুলিয়া ও তার আশেপাশের গ্রামে যাত্রার পালা, কবিগান, লেটোগান, মিলাদশরীফ, কোরান পাঠ ও কথকতা, কীর্ত্তন, বাউলসঙ্গীত হলেই ছুটে যেতেন দুখু মিঞা।... তাই মুসলিম ও হিন্দু পুরাণ কোন কিছুকেই তিনি বাদ দিতেন না। বালক বয়সেই সব ধর্মের প্রতি তার উদার মনোভাব গড়ে উঠেছিল।... এই বিশেষ গুণটি নজরুল লাভ করেছিলেন তাঁর বাবার নিকট থেকে। ফকির আহম্মদ নিজ ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও ছিলেন পরম সহিষ্ণু ও উদার। বাল্যে নজরুলকে চুরুলিয়ার রায় পাড়ার জোড়া কালি মন্দিরে ও প্রাচীন শিবমন্দির ও দামোদা মন্দির প্রাঙ্গণে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যেত। এসব কথা প্রাচীন লোকদের মুখে মুখে শোনা যায়। (কমলচন্দ্র, ২০০৯: ১৮-২১)

৮. গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর অভিমত —

প্রবল পশ্চিমী হাওয়ায় তখন ভেসে আসছে নানা চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব ও সৃজনশীল সাহিত্য। তারই অনুকরণে ও অনুসরণে মেতে উঠলেন তরুণদল। একদিকে ফ্রয়েড ও হ্যাভলক এলিসের অবচেতন লোকের যৌন মনস্তত্ত্ব, মার্কস ও রুশ বিপ্লব-বাহিত সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা, অন্যদিকে বন্ধন-অসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিচেতনা-সর্বস্ব ও বোহেমীয় জীবনবোধ-আশ্রিত কথাসাহিত্যের প্রবল অভিঘাতে উদ্বেজিত যৌবনদীপ্ত তরুণ কল্লোলপন্থী লেখকগোষ্ঠী বিশের দশকের শেষ পর্যায়ে বাংলা কথাসাহিত্যে এক আলোড়ন তুললেন। মণীন্দ্রলাল বসু, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল এই গোষ্ঠীর কয়েকটি বিশেষ নাম।... এঁদের সাহিত্য মুখ্যত নগরকেন্দ্রিক।... দরিদ্র, দুর্গত মানুষের যে ছবি ফুটল, তা কেবল শহরের বস্তি অঞ্চলের — গ্রাম জীবনের নয়।... সব মিলিয়ে কল্লোলপন্থীদের সাহিত্যে জীবনের ব্যাপক ও নিবিড় অভিজ্ঞতার অভাবটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। (১৯৭৭: ১৯৩)

৯. সুমিতা চক্রবর্তীর অভিমত —

'মৃত্যুক্ষুধা' এক রত্নপাত্র বিশেষ। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসেই নজরুল পৌঁছতে পেরেছেন সেই স্তরে যাকে বাখতিন বলেছিলেন বহু স্বর।... সবশেষে তুলব একটি প্রশ্ন। যখন উপন্যাস লিখেছেন নজরুল তখন বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল'-'কালি-কলম' পর্ব। সেই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে গোকুল নাগের 'পথিক', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' আর সেইকালে বিষয়ের নতুনত্বে শৈলজানন্দের 'বাঙালি ভাইয়া' (পরে 'মাটির ঘর' নামে প্রকাশিত) ছাড়া আর কোন উপন্যাসের কথা মনে রেখেছি আমরা? এই চারটি উপন্যাসের তুলনায় নজরুলের উপন্যাস খারাপ তো নয়ই, বরং ভালো। তাহলে এমন নিঃশেষে আমরা কেন ভুলে গেলাম

তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়?... কারণটি মনে হয় সামাজিক এবং কিছু লজ্জার। নজরুলের কবিতা প্রকাশিত হত সব পত্রিকায় —'কল্লোল', 'কালি-কলম' 'উত্তরা' সর্বত্র। কিন্তু তাঁর গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে কেবল মুসলমান সম্পাদক ও গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকায়। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'মোসলেম ভারত', 'নূর', 'নওরোজ', 'সওগাত'। সেই কালের পাঠক বলতে শতকরা আশি ভাগ পাঠকই ছিলেন বাঙালি হিন্দু পাঠক। তাঁরা এই পত্রিকাগুলি ভালো করে পড়তেন না নিশ্চয়ই। সংগ্রহেও রাখেননি। পরবর্তী সাহিত্য-গবেষকরা সাময়িকপত্রের আলোচনায় এগুলি খুব বেশি উল্লেখযোগ্যও মনে করেননি। আজ সেই ভুল শুধরে নেবার সময় এসেছে। (২০০৭: ১৪৪-১৪৬)

১০. কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়ক এলাকায় নজরুলের দিনযাপনকালীন বৃত্তান্ত এবং *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি জানতে দ্রষ্টব্য: ('আকবরউদ্দীন, 'চাঁদসড়কে নজরুল', কল্পতরু, ২০০০: ৬৩-৭১)

১১. সুকুমারী ভট্টাচার্যের অভিমত —

জন্মান্তরবাদ যে কৃষি সমাজের সৃষ্টি, এ ধারণায় সত্য থাকতে পারে। বীজ মাটিতে পড়ে শস্যরূপে দেখা দেয় কিছুকাল পরে — এর থেকে ধারণা হতেই পারে যে, মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা বা চূড়ান্ত অবসান নয়। বীজ-শস্যে যে পুনর্জন্ম, তার ধারণা সহজেই সংক্রমিত হতে পারে মানসিক স্তরে, তার থেকে পুনর্জন্মের সংজ্ঞা নিরূপিত হয় এবং মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করে।... এ তত্ত্ব মানুষের আত্যন্তিক নাস্তিতেও সম্ভাবনার দুঃসহ যন্ত্রণায় পরম সান্ত্বনা দিয়েছিল, এবং জীবনকে বাড়তি একটা রহস্যে মণ্ডিত করেছিল। শুধু যখন কর্মবাদ এসে জুড়ল জন্মান্তরবাদের সঙ্গে, কতকটা আকস্মিক ভাবেই, হয়ত তখনই একটা জটিল তত্ত্বজাল রচিত হল বহুতর রহস্যময় অনুষঙ্গ ও উপাদান নিয়ে। (১৯৯৭: ১৭)

১২. মুসলমান সম্প্রদায়ের লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির রুহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার পরিচিতজনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। তাকে দেখা যায় না, কিন্তু সে সবাইকে দেখতে পায়। সওয়াবের বা নেকির প্রত্যাশায় আল্লাহর কাছে মোনাজাত করা, দান-খয়রাত করা, গরিবদের খাওয়ানো, কোরআন খতম পড়ানো প্রভৃতির মাধ্যমে তার রুহের শান্তি কামনার রীতি প্রভৃতি তাদের লোকাচারে পরিণত হয়েছে, যার মূলে রয়েছে উপর্যুক্ত লোকবিশ্বাস। এ বিশ্বাস সম্প্রসারিত হয়ে লোকসংস্কার ও লোকাচারের আশ্রয়ে বহুকাল যাবৎ টিকে আছে। এছাড়া তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফ-এ বর্ণিত জ্বিন বা আগুনের জীবের (অশরীরী ও লোকচক্ষুর আড়ালে বিচরণশীল, তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইচ্ছামাফিক রূপ ধারণে সক্ষম) প্রতি লোকবিশ্বাসও পরিণতিতে এসব লোকসংস্কারের প্রতি মান্যতার ভিত্তি।

১৩. এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: তাশরিক, ২০২০: ৭৯-৯৮

১৪. ছুঁৎমার্গ বা স্পর্শদোষ সম্পর্কে নজরুলের অভিমত —

ছুঁৎমার্গ যখন ধর্মের অঙ্গ নয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি... আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের মতো একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে।... হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান

তাহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে,... কি বিপুল অবমাননা! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ বপন করিতেছ তোমরা! (২০০৭: ৩৯১-৩৯৪)

১৫. লেখক ঘুড়ি ওড়ানোর চিত্রকল্পে শাশুড়ি প্যাঁকালের মার সঙ্গে মেজো-বৌয়ের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাস সম্পর্কে জানিয়েছেন —

শাশুড়ি-মেজোবৌয়ে যেন ঘুড়ি খেলা চলেছে। মেজো-বৌ খেলে বেড়ায় মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে। শাশুড়ি মনে করে, হাতের বন্ধন এড়িয়ে ও চলে যেতে চায় সুতো ছিঁড়ে। তাই বাতাস যত জোর বয়, ও তত সুতো চেপে না ধরে সুতো ছেড়েই দিতে থাকে। কিন্তু ও সুতোরও শেষ আছে। তাছাড়া ঐ পচা সুতোর জোরই বা কতটুকু–তাও তো অজানা নেই ওর। তাই তার অসোয়াস্তির আর অন্ত নেই। (রফিকুল, ২০০৭: ৩২৫)

১৬. পবিত্র সরকারের অভিমত —

লোকভাষা (folk language) কোনো বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। নাগরিক ভাষার সঙ্গে — বাংলার ক্ষেত্রে মান্য মার্জিত কলকাতার বা শহরের 'শিষ্ট' ভাষার সঙ্গে বিরোধে যে ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হতে পারে তা-ই লোকভাষা।... ভাষায় সাধারণভাবে গ্রামীণতার যে-লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা করে চিহ্নিত করে সেগুলিই লোকভাষা বা গ্রামভাষার নির্ণায়ক। এই কারণে আমরা folk language-এর বাংলা হিসেবে 'গ্রামভাষা' কথাটি সুপারিশ করি, 'লোকভাষা' নয়। অবশ্য এই 'গ্রাম্য' কথাটির মধ্যে কোনো নিন্দা বা অবজ্ঞার প্রশ্ন নেই, এটি নেহাতই একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক ধারণা; যা নাগরিক বা শহুরে নয়, তা-ই গ্রাম্য। (২০০৩: ১৩৭)

গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ২০০৯। *কল্লোল যুগ*, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

কমলচন্দ্র মণ্ডল, ২০০৯। *কালজয়ী নজরুল*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

কল্পতরু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পা.), ২০০০। *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ১৯৭৭। *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ*, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলকাতা।

তুষার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৫। *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*, এ মুখার্জী অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

পবিত্র সরকার, ২০০৩। *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী, ২০০৯। *লোকসংস্কৃতির সাতকাহন*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৭। *কালের পুতুল*, নিউ এজ, কলকাতা।

মযহারুল ইসলাম, ২০১২। *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, অবসর, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), ২০০৭। *নজরুল-রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রাজিয়া সুলতানা, ২০০০। *কথাশিল্পী নজরুল*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, ১৯৯৭। *নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ*, ক্যাম্প, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তী, ২০০৭। *সৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে নজরুল*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সৈকত আসগর, ১৯৯০। *নজরুলের গদ্যরচনা : ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা

Maria Leach (edited), 1949. *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, Funk and Wagnalls Company, America, (in 2 volume).

সহায়ক প্রবন্ধ

আকবরউদ্দীন, ২০০০। 'চাঁদসড়কে নজরুল', *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, কল্পতরু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

কাজী নজরুল ইসলাম, ২০০৭। 'ছুৎমার্গ', *নজরুল-রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

তাশরিক-ই-হাবিব, ২০২০। 'ভারতীয় বর্ণ-জাতি প্রথার ইতিবৃত্ত', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, হারুন রশীদ (সম্পা.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শেখ মকবুল ইসলাম, ২০২১। 'নগর-ফোকলোর'। *লোকজ সংস্কৃতি*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ২০০০। 'কবি নজরুল ইসলাম : গদ্যের উপন্যাস', *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, কল্পতরু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

সৌমেন সেন, ২০২১। 'নাগরিক লোকসংস্কৃতি', *লোকজ সংস্কৃতি*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা।